

স্বপ্নের মানুষ, স্বপ্নের ফেরিওয়ালা

অভিজিৎ রায়

অভিনন্দন তৃতীয় বাঙালী, প্রথম বাংলাদেশী

প্রতিদিনই দেশের খবরের কাগজ খুললেই যখন খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, ছিনতাই, বেমামাজি, সন্ত্রাস, মৌলবাদের আগ্রাসন, সংলাপে ঢিলেমি ইত্যাদি খবরে মন বিষন্ন হয়ে যায়, ঠিক সেসময়ই ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল প্রাপ্তির সংবাদ আমাদের সবাইকে আক্ষরিক অর্থেই আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে। আনন্দিত হবার মতই খবর। একেবারে নোবেল বিজয়! এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি তো আর নেই। সেই যে ছোটবেলায় ক্লাস ফাইভের বাংলা বইয়ে পড়েছিলাম অখ্যাত বজ্রজোগিনী গ্রামের অতীশ দীপঙ্করের দ্বিগ্বিজয়ের গল্প। ‘বাংলার অতীশ লংঘিল গিরি, তুষার ভয়ঙ্কর’! ড. ইউনূসের নোবেল বিজয়ের সংবাদ পেয়েও আমার সেরকমই মনে হয়েছে। ইউনূসের নোবেল প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রথম আলোতে লিখেছেন^১, ‘দুঃখী বাংলাদেশের ভাঙাঘরে এ যে চাঁদের আলো’। নিঃসন্দেহে তাই। মুক্তমনার পক্ষ থেকে অধ্যাপক ইউনূসকে প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার জিতেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯১৩ সালে। সাহিত্যে। বাংলাভাষাকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেন তিনিই। তারপর দীর্ঘদিনের বিরতি। বিগত আশির দশকে আরেকজন বাঙালীকে নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়; তিনি ড. অমর্ত্য সেন। দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ দূরীকরণে তার সোশাল চয়েস তত্ত্ব, মানব উন্নয়ন তত্ত্ব কিংবা ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স একাডেমিয়ায় সাড়া ফেলেছিল অনেক আগেই। আশির পর থেকে প্রতিবছরই শুনতাম এই বুঝি অর্থনীতিতে নোবেল পাচ্ছেন অমর্ত্য। কিন্তু বিধি বাম। কোনদিনই যেন ভাগ্যের শিকে ছিড়ছিলো না। নব্বই-এ এসেও যখন অমর্ত্য নোবেল অর্জন করলেন না, তখন আমাদের স্বপ্ন অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছে। আমরা ধরেই নিয়েছি রবিঠাকুরই আমাদের সবে ধন নীলমনি। আর কখনই বোধ হয় কোন বাঙালীর কপালে নোবেলের ছিটেফোঁটাও নেই। এমনি এক সময় নব্বই এর শেষে এসে নোবেল জিতলেন অমর্ত্য সেন। ১৯৯৮ সালে। অর্থনীতিতে নোবেল জিতে বাঙালী মনীষাকে বিশ্বের দরবারে আরেকবার তুলে ধরলেন। আনন্দে ভাসালেন পুরো বাঙালী জাতিকে পুনর্বার।

এরই ধারাবাহিকতায় এবছর বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস জয় করলেন নোবেল প্রাইজ। নরয়েজিয়ান নোবেল কমিটি ২০০৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার মুহাম্মদ ইউনূস আর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তৃণমূল থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসেবে মূলতঃ তাদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এর পেছনে আছে মাইক্রো-ক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী। এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দুঃস্থ মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা যাবে বলে মনে করা হয়। তবে নোবেল কমিটির সাইটেশনে জামানত ছাড়াই দরিদ্রের ঋণ দেওয়ার বিষয়টিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশী। সেখানে বলা হয়^২ :

‘শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর অনেক দেশেই কোটি মানুষের স্বার্থে স্বপ্নের বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে মুহাম্মদ ইউনূস নিজের নেতৃত্ব গুণের পরিচয় ঘটিয়েছেন। জামানত ছাড়া দরিদ্র মানুষকে ঋণ দেওয়া অসম্ভব একটি ধারণাই ছিল। তিন দশক আগে যাত্রা শুরু করে গ্রামীণ

ব্যাংকের মাধ্যমে ইউনুস প্রথমবারের মতো এ অসম্ভব ধারণাকে শুধু ভাঙেননি, তিনি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন।’

একজন বাংলাদেশের নাগরিককে আমরা নোবেল বিজয়ী হিসেবে দেখব- এরকম আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে যে আসেনি তা নয়। সত্যি কথা বলতে কি, বছর কয়েক ধরেই মুহম্মদ ইউনুসের নাম জড়িয়ে কথা শোনা যাচ্ছিল নানা মহলে। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন তো তার নামে সুপারিশও করেছিলেন একসময়। তারপরও ইউনুস নোবেল পাচ্ছিলেন না। আর সে প্রাপ্তিযোগ্যতাই শেষ পর্যন্ত ঘটল এ বছর। মাথা যেন আমাদের সত্যিই আঁকাশ ছুলো!

স্বপ্নের ফেরিওলা

ড. ইউনুস দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সত্তরের দশকেই গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করলেও আমি তার নাম জানতে পারি আশি দশকের শেষ ভাগে এসে। জানতে পারলাম একজন মানুষ দারিদ্র দূরীকরণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। শুধু কাজ নয় যেন স্বপ্ন ফেরি করে বেড়াচ্ছেন, বলছেন এমন একটা সময় আসবে যখন বাংলাদেশে শুধু নয় সারা বিশ্বেই একটিও দরিদ্র মানুষও থাকবে না। তার ‘অসম্ভব স্বপ্নের’ এই প্রতিফলন দেখি ড. ইউনুসের লেখা ‘গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও আমার জীবন’ বইয়ে^৩ :

দৃঢ়ভাবে এবং গভীর ভাবে আমার মনে এই বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে যে আমরা এমন একটি পৃথিবী তৈরি করতে পারি যেখানে একজন মানুষও দরিদ্র থাকবে না। এটা সম্পূর্ণ আমাদের সমবেত ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। এই রকম একটা পৃথিবী সৃষ্টি করা সম্ভব হবে যদি সবাই মিলে আমরা এটা চাই। যা নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখি, শুধু তাই আমরা অর্জন করতে পারি। **অর্জনের আগে স্বপ্ন দেখাটা একটা জরুরী শর্ত।** দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী সৃষ্টি করা যে কোন অলীক স্বপ্ন নয় সেটা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাজ করতে গিয়ে প্রতিদিন প্রমাণ পেয়েছি। সামান্য পুঁজি হাতে পেয়ে গরীব মহিলা কীভাবে নিজেকে বিকশিত করতে থাকে সেটা দেখে যাচ্ছি অবিরামভাবে। এতে আমার বিশ্বাস কেবল দৃঢ়তরই হচ্ছে। এ পর্যন্ত বিশ্বাসে কখনও ফাটল ধরার কোন অবকাশ ঘটেনি।

হয়তো পাগলামি হিসেবেই নিয়েছিলাম তার এই উচ্চাভিলাসকে। এই ‘সামান্য পুঁজি’ হাতে ধরিয়ে দিয়ে কিছু গরীব মহিলাকে হয়ত ‘বিকশিত’ করা সম্ভব, কিন্তু দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী? স্বপ্ন বিলাশ ছাড়া আর কি! আমি কেন, পত্রিকায় তো দেখলাম তার স্ত্রী আফরোজী ইউনুস পর্যন্ত প্রথমে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উদ্যোগকে ‘স্নেহ পাগলামী’ বলেই মনে করেছিলেন^৪। তারপরও স্বাপ্নিক এ মানুষটিকে অস্বীকার করার উপায় আমাদের ছিল না। তিনি একক প্রচেষ্টায় দেখিয়েছেন কিভাবে অসম্ভবকে সফল করার প্রয়াস নিতে হয়। চুয়াত্তরে তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষক। ওই সময়ের দুর্ভিক্ষের ছবি তাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। এখানেও তার সাথে মিল আছে অমর্ত্য সেনের। অমর্ত্য সেনও ছোটবেলায় আলোড়িত হয়েছিলেন তেতাল্লিশের মনুস্তর দেখে। মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে দু’জনেই পন করেছিলেন এই হত দরিদ্র মানুষগুলোর জন্য কিছু করবেন। ১৯৭৬ সালে ইউনুস তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। তার চিন্তাধারার প্রয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন অখ্যাত জোবরা গ্রামকে। গ্রামে

গিয়ে খুব কাছ থেকে দেখেন হতদরিদ্র মানুষ গুলোর জীবন। এমনি একজন ছিলেন সুফিয়া বেগম। মহাজনের কাছে থেকে দিনে পাঁচ টাকা নিয়ে কঞ্চি কিনে সুন্দর সুন্দর মোড়া বানাতেন। তারপর মহাজনের কাছে আবার বিক্রি করতেন। এতে লাভ থাকত সর্বসাকুল্যে ৫০ পয়সা। ইউনুস দেখলেন স্রেফ পুঁজির অভাবেই সুফিয়া বেগমদের বিকাশ ঘটছে না। মহাজনদের খপ্পরেই ‘বন্দি জীবন’ কাটিয়ে চলেছে চীরটাকাল। তার মন আলোড়িত হল পুরোমাত্রায়। তিনি তার ভাষাতেই বর্ণনা করেছেন সে অভিজ্ঞতার কাহিনী^৫ :

‘সুফিয়া সিনে মাত্র পঞ্চাশ পয়সা রোজগার করে এই ভাবনা আমার অনুভূতিকে অসাড় করে দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে আমরা অনায়াসে কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে কথাবার্তা বলি আর এখানে আমার চোখের সামনে জীবন-মৃত্যুর মত সমস্যার হিসেব নিকেশ তৈরি হচ্ছে মাত্র ক’টা পয়সার দ্বারা? কোথাও কোন ভুল হচ্ছে। কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে এই মহিলার বাস্তব জীবন প্রতিফলিত হয় না? নিজের উপর ভীষণ ধিক্কার জাগল আমার। রাগ হল গোটা পৃথিবীর উপর, যে এ ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। কোথাও আশার আলো নেই, সমাধানের সূত্র পর্যন্ত নেই।...’

ড. ইউনুস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তার বিভাগের ছাত্রী মাইমুনাকে দিয়ে জরিপ করালেন জোবরা গ্রামে সুফিয়ার মত আরো কতজন গ্রামবাসী মহাজনের কাছ থেকে ধার নিতে বাধ্য হচ্ছে। এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট এসে পড়ল। বিয়াল্লিশ জন মানুষের তালিকা পাওয়া গেল যারা মহাজনের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত মোট ৮৫৬ টাকা ধার করেছেন। ইউনুসের মুখ দিয়ে বেড়িয়ে আসল - ‘হায় আল্লাহ, এতোগুলো মানুষের জীবনে দুর্দশা মাত্র ৮৫৬ টাকার অভাবে!’

ইউনুস উপলব্ধি করলেন, সুফিয়ারা যদি দিনের কাজ শুরু করার জন্য মহাজনের কাছ থেকে ওই পাঁচ টাকা নেওয়া বন্ধ না করে তাহলে বেগার শ্রমিক হিসেবে তাঁর ভূমিকা কোনদিনই পাল্টাবে না। তার ধারণা হল, ঋণই একমাত্র সেই টাকা পাবার রাস্তা। ব্যাংক থেকে ঋণ পেলে আর তার মহাজনের কাছ থেকে যেতে হবে না, খোলা বাজারেই তার মাল সে বিক্রি করতে পারবে। কাঁচামাল আর প্রাপ্ত দামের মধ্যে গ্রহণযোগ্য লাভও থাকবে। কিন্তু ব্যাঙ্ক তো আর জামানত ছাড়া ঋণ দেয় না। আর সুফিয়ার পক্ষেও জামানত দেওয়ার মত কিছু নেই। তাহলে এই দুশ্চক্র ভাঙবে কি করে?

ড. ইউনুস সুফিয়াকে সাথে নিয়ে আগস্ট মাসে ভূমিহীন কয়েকজনের নামে ঋণের ব্যবস্থা করতে জনতা ব্যাঙ্কের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় যান। কিন্তু ব্যাঙ্ক তো জামানত ছাড়া ঋণ দেবে না। ইউনুস সাহেব জামানত ছাড়া ঋণ চাইছেন দেখে সবাই ভাবলেন উনি পাগল! ইউনুস সাহেব কোন উপায়সূত্র না দেখে শেষ মেঘ ব্যক্তিগত গ্যারান্টির মাধ্যমে তাদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করলেন। ঋণ যাতে তারা শোধ করতে পারে সেজন্য প্রথমে দৈনিক, পরে সাপ্তাহিক জমার ব্যবস্থা করা হয়। গঠন করা হয় পাঁচ থেকে দশ জনের একটি গ্রুপ। ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বাড়তে থাকলে তিনি কৃষি ব্যাঙ্ক থেকেও ব্যক্তিগত গ্যারান্টির মাধ্যমে ঋণের ব্যবস্থা করে দেন। ওই বছরই ব্যাঙ্কের তৎকালীন এমডির সাথে কথা বলে তিনি জোবরা গ্রামে কৃষি ব্যাঙ্কের একটি শাখা খোলার ব্যবস্থা করেন। এভাবেই ‘ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প’ প্রাথমিক গতি পায়। পরে চট্টগ্রাম, ঢাকা, রংপুর, পটুয়াখালীসহ দেশের নানা প্রান্তে ক্ষুদ্রঋণের কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯৮৩ সালে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আওতায় ষাট লক্ষাদিক লোক ঋণসুবিধা পাচ্ছে। দেশের সত্তর হাজার গ্রামে তাদের কর্মসূচী চলছে। ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে আবার ৯৭ ভাগই নারী। ঋণ বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা। এর বিপরীতে আদায় করেছে সাড়ে পচিশ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ, প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে আদায়ের হার ৯৮.৫ শতাংশ। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও ড. ইউনুসের প্রস্তাবিত ‘মাইক্রো-ক্রেডিট মডেল’ যে আমেরিকা, স্পেন সহ ২৩ টি দেশে প্রয়োগ করা হয়েছে আর ড. ইউনুস তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ নোবেল ছাড়াও ষাটটির বেশী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন সে তো পত্র-পত্রিকা মারফত সবারই এখন জানা।

ড. ইউনুসের যে ব্যাপারটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল আধুনিক প্রযুক্তির প্রতি আস্থা। মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ইমেইল, ইকমার্স, ইসার্ভিস, ফাইবার অপটিক্স নির্ভর তিনি প্রযুক্তি ভিত্তিক সমাজ গড়তে চান, আধুনিকতম প্রযুক্তিকে দেশের আপামোর জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান। এখানেও অবিচল তার স্বাপ্নিক দৃষ্টিভঙ্গী - ‘অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ পেতে যাচ্ছি নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে।... মানুষে মানুষে এই দূরত্বহীনতা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যয়হীনতা গরিব দেশ গুলোর জন্য একটা অপূর্ব সুযোগের সৃষ্টি করেছে।’ বিরোধীপক্ষ নাক কুঁচকান, যে দেশে মানুষ দু’বেলা খেতে পায় না এত ‘যোগাযোগ আর দূরত্বহীনতা’ দিয়ে কি হবে! কথায় যুক্তি আছে বটে! তবে সেই কবে মানুষ দুবেলা খেতে পারবে সে আশায় বসে না থেকে ‘দারিদ্র বিমোচনের’ উদ্যোগের পাশাপাশি ড. ইউনুস উন্নত প্রযুক্তিকেও সাধারণ মানুষদের মাঝে পৌঁছাতে চান। হয়ত তিনি বলতে চান, ‘যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে’। এবারে বাংলাদেশে গিয়ে এমনকি খুব সাধারণ স্তরেও মোবাইল ফোনের যে ব্যাপক ব্যবহার দেখলাম, তাতে তার বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখেছি। নতুন প্রযুক্তির আগমনে ভিতরে ভিতরে না হলেও অন্ততঃ উপরে উপরে সমাজের খোল-নলচে বদলে ফেলছে, রচনা করছে সামাজিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনের ভিত। তারপরও হয়ত প্রশ্ন থেকে যায় প্রযুক্তি কি সত্যি সাধারণ মানুষের উপকারে লাগছে নাকি শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠছে এক শ্রেণীর ‘মুনাফাখোরদের হাতিয়ার’?

ড. ইউনুসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বোধ করি নারীর ক্ষমতায়ন আর নারীদের উপার্যনমূলক কাজকর্মে টেনে আনার ক্ষেত্র তৈরি করা। এই ব্যাপারটির কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে ইউনুসকে দিতেই হবে। একজন কটর ‘ইউনুস-বিরোধী’ও ব্যাপারটি স্বীকার করবেন। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার আগে ঋণগ্রহীতার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ছিল এক শতাংশেরও কম। যাও বা কেউ ঋণ পেতেন, তাও বহু কাঠ খড় পুড়িয়ে। আর হাস্যকর সব প্রশ্নের তীক্ষ্ণ বাণ সহ্য করে। যেমন, গরীব বৌ ঝি রা দূরে থাক, বাংলাদেশের এমনকী সচ্ছল মহিলারাও ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে চাইলে ম্যানেজার সাহেব প্রশ্ন করেন : ‘আপনি কি আপনার স্বামীর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন?’

তিনি হ্যা বললে তখন আবার প্রশ্ন হয় : ‘তিনি কি আপনার প্রস্তাব সমর্থন করেন?’

এর উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, সেখানেই কিন্তু প্রসঙ্গের ইতি টেনে ঋণ দেওয়া হয় না। ম্যানেজার সাহেব বিনীত ভাবে আনুরোধ করবেন, ‘একবার আপনার স্বামীকে নিয়ে আসুন। তাঁর সঙ্গে আমাদের আলোচনা হ.য়া দরকার।’

কিন্তু কোন পুরুষকে ঋণ দেবার সময় কিন্তু কোন ম্যানেজার এরকম সওয়াল জবাবের কথা ভাবতেই পারেন না। ঋণ নেওয়ার সময় স্ত্রীর সাথে আলোচনা করেছেন কিনা, কিংবা আলোচনার জন্য স্ত্রীকে

প্রয়োজন কিনা এসব প্রসঙ্গ কারও মনেই উদয় হয় না। এ প্রসঙ্গ তোলাই বোধ হয় সে ক্ষেত্রে অপমানজনক!

নিঃসন্দেহে ড. ইউনুস সামাজিক অবকাঠামোটি কিছুটা হলেও ভেঙেছেন। ইউনুস ঠিক করেছিলেন ঋণদানের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এতো জানা ছিলই যে, যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হয় জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি আর সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করা তাহলে স্বাভাবিকভাবে মহিলাদের প্রতিই প্রথম মনোযোগ দেওয়া উচিত। ইউনুস সেটা করে দেখিয়েছেন। এর প্রভাব যে সামাজিক ভাবে পড়েনি তা নয়। প্রথম দিকে স্বামীরা স্ত্রীর এই অহেতুক বাইরে গিয়ে ‘পর পুরুষ’দের কাছ থেকে টাকা নেওয়াকে ভালভাবে নেয় নি। মনোমালিন্যও হয়েছে বিস্তর। কিন্তু পরে যখন স্ত্রীরা সেই টাকা দিয়ে গরু বাছুর কিনে কিংবা হাঁস মুরগীর খামার করে সংসারের অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে, তখন সেই স্বামীরাই আনন্দে আত্মহারা হয়েছে। তবে একটি ক্ষেত্রেই সমস্যা হয়েছে, যা ‘স্বামী’ জয়নালের কর্ণে স্পষ্ট : ‘একটাই হয়েছে মুশকিল। এর আগে রাগারাগি হলে স্ত্রীকে মারধোর করে গায়ের ঝাল মেটাতাম। কিন্তু শেষ যে বার ওর গায়ে হাত তুলেছিলাম খুব ঝামেলায় পড়েছিলাম। ফরিদার দলের সব মেয়েরা এসে গাল দিতে লাগল।...’^৬

সমীক্ষায় দেখা গেছে নারীর ক্ষমতায়ন হলে, নারী স্বাবলম্বী হলে স্ত্রী-নির্যাতনের ঘটনা এমনিতেই কমে যায়। ড. ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে সে দিক থেকেও তার স্বপ্নকে পূর্ণতা দিয়েছেন। এ কিন্তু কম নয়।

একজন মুক্তিযোদ্ধার নোবেল প্রাপ্তি

ড. ইউনুস মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন একজন ‘প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা’ ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ড. ইউনুস যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত প্রবাসী বাঙালীদের নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে প্রচারাভিযান চালান। সে সময় তিনি ফুল ব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে শিকাগোর ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে সবেমাত্র পিএইচডি শেষ করেছিলেন আর মধ্য টেনেসির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন। মার্কিন স্ত্রীর (ভিরা ফেরোস্টেন) সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৫ এ মার্চ বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু হলে তিনি দেশে ফেরার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে সেখানেই মুক্তিযুদ্ধের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সেসময় বাংলাদেশ নাগরিক সমিতির সচিব ও মুখপত্র ছিলেন। স্থানীয় রেডি. টেলিভিসনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্য ও খবর সরবরাহ করতেন আর পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য প্রতিনিধি পরিষদ ও সেনেটের সদস্যদের বার্তা পাঠাতে রেডি. টিভিকে অনুরোধ করতেন। তিনি এবং তার সহযোগী ব্যারিস্টার শামসুল বারী ওয়াশিংটনের সব দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তারা বাংলাদেশ ‘নিউজ লেটার’ নামে সে সময় একটি পত্রিকা বের করেছিলেন যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আমেরিকান ও প্রবাসী বাঙালীদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের দলিল স্বরূপ। যুদ্ধের নয় মাসে এর ১২টি সংখ্যা বেরিয়েছিল। এই সংখ্যাগুলোতে সুদূর উত্তর আমেরিকা ও ক্যানাডা থেকে লেখা সংগ্রহ করে এবং নিজেও লিখে অনবদ্য অবদান রেখেছিলেন। বাংলাদেশের সংবাদ প্রচারের জন্য একটি ভ্রাম্যমান বেতার কেন্দ্র স্থাপন করারও পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। তার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের বর্ণনা আছে তার লেখা ‘গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন’ (২০০৫) বইয়ের ‘বিয়ে ও মুক্তিযুদ্ধ’ (ষষ্ঠ) অধ্যায়ে। এ ছাড়া ড. ইউনুস খুব ভাল কার্টুনও আঁকতেন। তাঁর নিজ হাতে আঁকা বেশ কিছু কার্টুন ‘নিউজ লেটার’-এ ছাপা হয়। ১৯৭১ সালের ওই রক্তক্ষরা দিনগুলোতে তার আঁকা কার্টুন

গুলো শিল্পমানেও ছিল খুব উঁচু। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এ তার আঁকা বেশ কিছু কার্টুন রাখা আছে। একজন মুক্তিযোদ্ধার নোবেল প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে আমাদের আনন্দিত করে।

অর্থনীতিতে না হয়ে শান্তিতে কেন?

এই প্রশ্নটি সব জায়গায়ই উচ্চারিত হয়েছে, সব মহলেই আলোচিত হয়েছে দেখলাম। সত্যি বলতে কি ড. ইউনুসের শান্তিতে নোবেল বিজয়ে আমি যতটা না অবাক হয়েছি, তার চেয়ে ঢের বেশি অবাক হয়েছি এ প্রশ্ন যারা করছেন তাদের দেখে। আমার কিন্তু কখনই মনে হয়নি যে ড. ইউনুস অর্থনীতিতে নোবেল পেতে পারেন, তা নিয়ে যতই গুজব সৃষ্টি করা হোক না কেন। ক্ষুদ্র ঋণের ব্যাপারটা আসলেই ড. ইউনুসের নতুন কোন উদ্ভাবন নয়। ধারণাটি বিভিন্নভাবে আমাদের সমাজে ছড়িয়ে ছিলই, অনেক আগে থেকেই। এমনকি রবীন্দ্রনাথের ‘কাবুলিওয়ালাতে’ও আমরা এই ধারণার প্রতিফলন দেখি। ড. ইউনুস এই বিদ্যমান ‘ক্ষুদ্র ঋণের’ ধারণাটিকে ‘রি-প্যাকেজিং’ করে বাজারজাত করেছেন। ড. ইউনুসের সাফল্য অন্যখানে। তিনি এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। তার মত করে বাংলাদেশের বহু মহিলার ভাগ্যন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন তিনি। জামানত ছাড়া ঋণ দিয়েছেন, এমনকি ভিক্ষুকদেরও। এ ব্যাপারগুলো অর্থনীতির মূল নিয়ম কানুনের উল্লিখিত জন্য যতটা না সম্পর্কিত, তার চেয়ে ঢের বেশি সম্পর্কিত সামাজিক পরিস্থিতি ও সমস্যা মোকাবেলার। আমার মনে পড়ছে সিঙ্গাপুর থেকে চলে আসার আগে স্বপনদার (স্বপন কান্তি বিশ্বাস, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত; মুক্তমনার লেখক এবং এককালের অণু পত্রিকার সম্পাদক) সাথে তার এনইউএস-এর ক্যান্টিনে কথা হচ্ছিল এ নিয়ে। তিনিও খুব স্পষ্ট করেই সেদিন বলেছিলেন, ‘ড. ইউনুস নোবেল পেলে শান্তিতে পেতে পারেন, কখনই অর্থনীতিতে নয়।’ আমি চায়ের কাপে আলতো চুমুক দিয়ে বলেছিলাম, ‘তথাস্তু’!

কিছু প্রান্তিক সমালোচনা

কোন মতবাদই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। নয় অধ্যাপক ইউনুসের কর্মকান্ড। ড. ইউনুস তার মাইক্রো-ক্রেডিটের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের স্বপ্ন দেখলেও, অনেক অর্থনীতিবিদই তার এ প্রত্যাশাকে ‘দিবাস্বপ্ন’ বলেই মনে করেন। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ ১৫ ই অক্টোবর ভোরের কাগজে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ড. ইউনুসের নোবেল প্রাপ্তির উপর একটি প্রতিক্রিয়া লিখেছেন^১। তার বক্তব্য এবং সমালোচনাগুলো সত্যই প্রাণিধানযোগ্য। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাইক্রো ক্রেডিট ব্যবস্থা গ্রামীণ মহাজনদের হাত থেকে কিছু দুঃস্থ নারীকে মুক্ত হতে সাহায্য করলেও, পরিপূর্ণ ভাবে মুক্ত করতে পারে কি? আকাশ একটি চমৎকার উপমা দিয়েছেন। বলেছেন, ‘ঋণ না পেলে হয়তো ওই নারীরা একদম ডুবে যেত, কিন্তু ঋণ পাওয়ার ফলে তারা বড় জোর নাক ভাসিয়ে ভেসে থাকার সুযোগ পান। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে নিজের পায়ে স্থায়ী ও সবলভাবে দাঁড়াতে কখনই সক্ষম হন না।’ অর্থনীতির ভাষায় বলতে গেলে, এই মাইক্রো-ক্রেডিট মাইক্রো-মবিলিটি তৈরী করে মাত্র, এ দিয়ে দারিদ্র্য সমস্যার ‘ম্যাক্রো’ সমাধান সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে ‘স্বাবলম্বী’ হওয়ার উপায় হিসেবে ইউনুস প্রায়ই ‘ধান ভানা, গাভী পালা, তাঁত বোনা, বেতের কাজ করা’-কে^২ সমাধান হিসেবে হাজির করলেও তার শিল্প বিরোধিতা তার বিভিন্ন বক্তব্যে এবং কর্মকান্ডে খুব সুস্পষ্ট। শ্রমিকদের কাজের এবং তাদের দাবীর মূল্যায়নও তার কাছে গৌন। যেমন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত একটি রিপোর্টে তিনি বলেন :

‘কর্মসংস্থান হলেই দারিদ্র্যের অবসান হবে এ রকম ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা দারিদ্র্যের কথা উঠলেই কর্মসংস্থানের খোঁজ করি। কর্মসংস্থান মানেই দারিদ্র্যের অবসান নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান দারিদ্র্যকে চিরস্থায়ী করে দেবার একটি ব্যবস্থা মাত্র। কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে সারা জীবন বস্তিতে কাটানোর নাম দারিদ্র্যের অবসান নিশ্চয়ই নয়।’

ওই রিপোর্টে আরো বলা হয় :

‘মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের মধ্যে এ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনে দারিদ্র্যের অবসান হবে না।’

উপরোক্ত দুটি উক্তিতে ড. ইউনূসের শিল্প বিরোধিতা খুব স্পষ্ট। তিনি চান না শ্রমিকেরা শিল্পকারখানায় কাজ করুক, কারণ তিনি ধরেই নিয়েছেন এতে ‘দারিদ্র্যের অবসান হবে না’। একটি দেশের শিল্প বিকাশ রুদ্ধ করে অর্থাৎ শ্রমিকদের শিল্প কারখানায় কাজ করাকে নিরুৎসাহিত করে শ্রেফ ‘হাঁস মুরগি পালন’ কিংবা ‘মোড়া বানানোর’ মাধ্যমে জনগণকে সুখী সমৃদ্ধ করার যে কোন পরিকল্পনা কি প্রকারভেদে জনস্বার্থের বিপক্ষে যায় না? আর সব কিছু যদি বাদও দেই, এ ধরনের ‘মহান’ পরিকল্পনার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ স্বপ্ন বিলাস ছাড়া আর কি?

ইউনূস শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য দারিদ্র্য, জীবন যাত্রার নিম্নমান, বস্তিতে থাকা ইত্যাদি চিরস্থায়ী ব্যাপার বলেই মেনে নিয়েছেন। শুধু সমাজতান্ত্রিক বিশ্বেই নয়, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গুলোতেও শ্রমিকেরা আন্দোলন করে যে ন্যায্য মজুরী আদায় করতে পারে কিংবা জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে পারে তার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। আধুনিক কালের ‘ওয়েল ফেয়ার স্টেট’ গুলোও তার প্রমাণ। অথচ ইউনূস বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নয়নের সমস্ত সম্ভাবনা নাকচ করে দেন। ড. ইউনূস আরো বলেন,

‘আমরা সবসময়ই কর্মসংস্থান বলতে চিন্তা করি মজুরী শ্রমিক হিসেবে কর্মসংস্থান। মানব জাতির কর্মসংস্থান এভাবে সৃষ্টি হয়নি। যখন আমরা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ইতিহাসের দিকে তাকাই তখন দেখি যে প্রত্যেকে নিজে নিজের কাজ করছে, নিজের কাজের মাধ্যমে অর্থাৎ আত্ম নিযুক্তির মাধ্যমে জীবিকার সন্ধান করছে।... কিন্তু এ সব অর্থনীতিবিদ দের দৃষ্টির বাইরে।’

ড. ইউনূস নিজেকে মনে-প্রাণে আধুনিক দাবী করেন, আধুনিক প্রযুক্তিকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিতে চান, অথচ তার উপরোক্ত বক্তব্য খুবই পশ্চাৎপদ। তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন ইতিহাসের একদম আদিম স্তরে যখন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শ্রেফ শুরু হয়েছে, রোল-দেল করেছেন আদিম কালকে যখন শিল্প বিকশিত হয় নি সে সময়। মানুষ তো একসময় গাছে বা গুহায়ও থাকত, হারিকেনের আলোয় পড়ত, খড়ি দিয়ে রান্না করত। ইউনূস কি সেই পশ্চাৎপদ সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায় আমাদের ফেরৎ নিয়ে যেতে চান, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। জনাব আকাশ তার লেখায় বলেছেন, ‘তিনি (ড. ইউনূস) যে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্যারামিটারগুলো মেনে নিয়ে তার মধ্যেই সংস্কারের মাধ্যমে দারিদ্র্যের অবস্থা উন্নত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন -সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।’ ড. আনু মুহম্মদও অনেকটা একই রকম প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন,^{১০} ‘আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় লগ্নি পুঁজির ভূমিকা অন্য যে কোন

পুঁজির তুলনায় বেশি। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়। সে ক্ষেত্রে এই পুঁজির বিনিয়োগ ক্ষেত্র সীমিত হয়ে আসছিল, সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত হয় সংকটে পতিত হচ্ছিল, সেখানে ব্যক্তিগত ব্যবস্থায় একটা নতুন পথ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে বিশ্বের সামনে উপস্থিত করা ও জনপ্রিয় করাতেই তার আসল কৃতিত্ব। কিন্তু এ পদ্ধতির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে এটা ঠিক নয়।’ আমি বিনীত ভাবে উপরোক্ত দু বিশেষজ্ঞের সাথেই দ্বিমত পোষণ করছি। ড. ইউনুসের পদক্ষেপ কোন কোন কোন ক্ষেত্রে এমনকি দেশে পুঁজির সুস্থ বিকাশেরও পরিপন্থি। এটা ঠিক কিছু নারীকে তিনি মহাজনের খপ্পর থেকে উদ্ধার করেছেন, কিন্তু তাদের শেষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন ওই ‘বেত বোনা’ কিংবা ‘হাঁস-মুরগী পালনের’ মধ্যেই। তাদের পরবর্তী উন্নয়নকে তরান্বিত করার কোন উদ্যোগ তার নেই, কারণ তিনি চান না তাদের দক্ষতা শিল্প পর্যায়ে বিকশিত হোক। তার প্রচেষ্টা অনেকটা ওই গান্ধিজীর মত যেটি চরকা কেটে নিজের পোষাক তৈরীর মধ্যেই সমাধান খুঁজে, বাড়তি কিছু আর নয়। কিন্তু দরিদ্রদের প্রান্তিক অর্থনীতি থেকে ক্রমান্বয়ের মাধ্যমে টেনে উঠিয়ে অর্থনীতির মূল ধারায় স্থাপন না করতে পারলে কখনই যে দারিদ্রের স্থায়ী সমাধান হবে না, তা অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণগ্রহীতাদের শতকরা সাতানব্বই ভাগই নারী। অর্থাৎ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক জোরে সোরে প্রচার করছে যে তারা মূলতঃ নারীদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যই কাজ করছে। ব্যাপারটা হয়ত সত্য, কিন্তু ব্যতিক্রমী কি? আমাদের গার্মেন্টস শিল্পেও যে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত আছে তার আশি-নব্বই শতাংশই তো নারী। গ্রামাঞ্চলে ‘কাজের বিনিময়ে খাদ্য’ কর্মসূচীতেও বিপুল সংখ্যক নারী শ্রমিকের উপস্থিতি থাকে। কাজেই নারীদের ভাগ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রেও ড. ইউনুস একক কোন কৃতিত্ব সম্ভবত দাবী করতে পারেন না।

আরেকটি ব্যাপার তো বলাই বাহুল্য। ঋণের অর্থ হল পরনির্ভরশীলতা, তা সে ব্যক্তির কাছ থেকে হোক কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেই হোক। অথচ, মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেওয়াকে ইউনুস হয়ে প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়াকে আবার করেন মহিমাম্বিত। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক মহান কিছু নয়, শ্রেফ বানিজ্যিক একটি ব্যাঙ্ক। এর সুদের হারও খুব চড়া। কাগজে কলমে এ সুদের হার ২০%। আর কার্যকর সুদের হার প্রায় ৩০%^৭। যেখানে অন্যান্য বানিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোতে সুদের হার ১৮ শতাংশের বেশী নয়। সুদের উচ্চ হার নিয়ে অবশ্য ইউনুসের কোন মাথা ব্যথা নেই। তিনি বলেন, ‘নিশ্চয়ই আমরা ২০ ভাগ সুদ নেই। যদি কেউ বেশি বলে তো বেশি। তাতে আমি বেশি বিব্রত বোধ করি না। আমরা তো কাউকে জোর করে ঋণ দেই না।’ অর্থাৎ ড. ইউনুস ‘বেশি’ বিব্রত না হলেও ব্যাপারটি অল্প হলেও তার জন্য বিব্রতকর। বাংলাদেশে যেখানে অপেক্ষাকৃত ধনীরা ১২-১৫ শতাংশ হারে আনেক বড় অঙ্কের ঋণ পেয়ে থাকেন, সেখানে গরিব মহিলারা যারা ঠিকমত ঋণ শোধ করেন তাদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে উচ্চতর সুদ। অথচ বড়লোকরা দিচ্ছে নিম্নতর সুদ। এটি কেমন ন্যায়বিচার? আবার ইউনুস দাবী করেন তিনি ‘কাউকে জোর করে’ ঋণ দেন না। কিন্তু একই ভাবে চিন্তা করুন, কার্তিক বা চৈত্রমাসে খরা কবলিত কৃষককেও গ্রামীণ মহাজন কি জোর করে ঋণ দেয়? বিপদে পড়ে ঋণ নিয়েই সর্বসান্ত হয় প্রান্তিক কৃষক। আর তাছাড়া জোর না করলেও উচ্চ ঋণের হার বরং ড. ইউনুসের শ্রেফ ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিই প্রকাশ করে, প্রচারের আলোয় আসা ‘জনহিতকর’ তো নয়।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মকান্ডকে অনেকেই ‘দারিদ্র বিমোচন’ না বলে ‘দারিদ্র বাণিজ্য’ হিসেবে অভিহিত করেন। এর কিছু কারণ তো অবশ্যই আছে। ড. ইউনুসের সম্পত্তির পরিমাণ কত? সঠিক তথ্য হয়ত জানা যাবে না। সম্ভবত বিলিয়ন ডলারের কম নয়। ব্যাঙ্কগুলোর দিকেই দেখুন : নামে ‘গ্রামীণ’, কিন্তু তাদের সুরম্য অট্টালিকা যেন পারলে টুইন টাওয়ারকেও ছাড়িয়ে যেতে চায়! আমেরিকার পাবলিক ব্রডকাস্টিং

সিস্টেম (পিবিএস) নামের সরকারী টিভির একটি প্রামাণ্যচিত্রের জন্য হোয়ারটন স্কুল অব বিজনেস ২০০৪ সালে অধ্যাপক ইউনুসকে ‘গত ২৫ বছরের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ২৫ জন ব্যবসায়ী’ হিসেবে মনোনিত করেছে^{১১}। এই পঁচিশ জন ব্যবসায়ীর মধ্যে আছেন বিল গেটস, জর্জ সোরোস, অপরা উইনফ্রে, জেফ বেজোস, রিচার্ড ব্রানসন, ওয়ারেন বাফেট, মাইকেল ডেল, অ্যালেন গ্রীনস্প্যান, লি লাকোকা, চার্লস সোয়াব, ফ্রেডরিক স্মিথ কিংবা স্যাম ওয়াল্টনের মত ধনকুবেররা। এ থেকেই ড. ইউনুসের সামাজিক অবস্থান সহজেই অনুমেয়। ‘গরীব মানুষের বন্ধু’ হিসেবে তার এবং তার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের যে ‘ভাবমূর্তি’ গড়ে তোলা হয়েছে, উপরোক্ত তথ্যগুলো তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি?

তবুও স্বপ্ন দেখি আলোকিত ভবিষ্যতের

পুরস্কার খেতাব ইত্যাদি মতাদর্শহীন কোন নিরীহ বিষয় নয়, কখনও ছিলও না তা। এর রয়েছে নিজস্ব রাজনীতি, অর্থনীতি ও মতাদর্শ। কোন পুরস্কার কারা নিচ্ছে, কাকে দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে, কেনইবা কেউ তা পাচ্ছে বা কেন বা কেউ তা পাচ্ছে না, বা পেলেও প্রত্যাখ্যান করছে এমন বিষয়গুলো সবসময়ই ভেবে দেখবার মত। যেমন ড. ইউনুস এর আগে (১৯৯৪ সালে) ‘বিকল্প নোবেল’ হিসেবে খ্যাত *ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ* পেয়েছিলেন। এই পুরস্কারের পৃষ্ঠপোষকদের অন্যতম হচ্ছে মোনসান্তো, কার্গিল সহ বেশ কিছু বিতর্কিত বহুজাতিক কোম্পানি। এই পুরস্কার প্রাপ্তির চার বছরের মধ্যে ড. ইউনুস বিতর্কিত মোনসান্তোর ক্ষতিকর টার্মিনেটর ও এবং জি এম প্রযুক্তি বাংলাদেশে বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন^{১২}। এবার ড. ইউনুস নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কারটি অতীতে এমন কিছু লোককে দেওয়া হয়েছিল যাতে এর মর্যাদা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এর পেছনে ‘রাজনীতি’ কাজ করে বলেও অনেক বিদ্বজ্জনের ধারণা। নিঃসন্দেহে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজি ও প্রযুক্তিকে তৃতীয় বিশ্বের দরজায় নিয়ে আসার জন্য ড. ইউনুস বর্তমানে ‘কর্পোরেট জগতের মোস্ট ফেবারিট বয়’। তৃতীয় বিশ্বে বিনিয়োগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পঞ্চাশ থেকে সত্তরটি দেশে আন্তর্জাতিক লগ্নীকারীদের নিরাপদ অর্থের বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেবার কৃতিত্ব অবশ্যই ড. ইউনুসের রয়েছে এবং সে জন্যই ড. ইউনুসের স্থান হয়েছে বিশ্বের পঁচিশ জন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর কাতারে। পশ্চিমা বিশ্ব নিঃসন্দেহে ব্যাপারটি জানে।

তারপরও কথা থাকে। ড. ইউনুসের প্রবল সমালোচনা যে মহলটি থেকে মূলতঃ উৎসারিত হয়, তারাও যে খুব ‘ধোয়া তুলসী পাতা’ তা কিন্তু নয়। এই মহলটির অধিকাংশ সমালোচনাই এখন সাম্রাজ্যবাদকে গালাগাল দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সমাধান বাৎলে দেবার মধ্যে নয়। তাদের আদর্শের রোল মডেল রাষ্ট্র গুলো ‘সাম্যবাদের’ কথা বললেও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সাথে পাল্লা দিয়েই একসময় বিধ্বংসী সমরাস্ত্র বানিয়েছে, সামরিক বাজেটে ব্যয় বৃদ্ধি করেছে, নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, এমনকি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অনুকরণে অন্যদেশে হামলা পর্যন্ত চালিয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে পাল্লা দিয়ে টিকতে না পেরে এদের অনেকের বিলুপ্তি পর্যন্ত ঘটেছে। এগুলো সবই রুঢ় বাস্তবতা। ড. ইউনুস আজকের বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে থেকে তার সংস্কার এবং উন্নয়নের জন্য ভিন্ন ধরনের কিছু পথ বাংলাতে চাচ্ছেন কিংবা পেরেছেন - সে হিসেবে ড. ইউনুস সাধুবাদ পেতেই পারেন। তবে এজন্য ড. ইউনুসকে ‘অমর্ত্যলোকের দেবতা’ বানিয়ে মাথায় নিয়ে নাচানাচি না করে কিংবা ‘সাম্রাজ্যবাদের দালাল’ উপাধি দিয়ে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ না করে বরং তার পদক্ষেপ এবং প্রচেষ্টাগুলোকে খোলা মনে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারলে হয়ত তার মধ্য থেকেই দেশের জন্য উৎকৃষ্ট কিছু বেড়িয়ে আসার সুযোগ রয়েছে। দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে ড. ইউনুসকে ঘিরে জনগণের মধ্যে যে আশা আর প্রত্যাশার সঞ্চারণ হয়েছে তা সবার কাছেই আজ স্পষ্ট। আবেগের পাশাপাশি দেশের মানুষের সচেতনতাবোধ জেগে উঠলে আমরা এই

বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যেও আলোকিত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারি; সুমন চট্টপাধ্যায়ের মত ‘কার তাতে কী, কার তাতে কী, আমরা যদি এই আকালেও স্বপ্ন দেখি!’

তথ্যসূত্র :

- (১) দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর, ২০০৬
- (২) নোবেল কমিটির সাইটেশন; The Nobel Peace Prize for 2006; http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/press.html
- (৩) মুহাম্মদ ইউনুস, গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন, দ্বিতীয় মূদ্রণ, ২০০৫।
- (৪) দৈনিক যায়যায়দিন, ১৪ অক্টোবর, ২০০৬
- (৫) মুহাম্মদ ইউনুস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।
- (৬) মুহাম্মদ ইউনুস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫।
- (৭) এম এম আকাশ, প্রতিক্রিয়া : ড. ইউনুসের নোবেল, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৫ অক্টোবর, ২০০৬
- (৮) মুহাম্মদ ইউনুস, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতা, ৮ মে, ১৯৯৩
- (৯) বদরুদ্দীন উমর, ডক্টর ইউনুসের দারিদ্র্য বানিজ্য, সংস্কৃতি প্রকাশনী, ২০০৬, পৃঃ ১৫।
- (১০) আনু মুহাম্মদ, তার নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তি তাৎপর্যপূর্ণ, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৫ অক্টোবর, ২০০৬
- (১১) ওসমান তঈয়ুব চৌধুরী, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুসের একটি বিশ্লেষণমূলক পরিচিতি : গরীবের ব্যাঙ্কওলা, না আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির দালাল? সংস্কৃতি প্রকাশনী, ২০০৬।